A

SHORT SKETCH

OF THE

LIFE AND WORK

OF

MARY CARPENTER.

SECOND EDITION.

কুমারী কার্পেণ্টারের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(গত ১০ই জুলাই ১৮৭৭, কুমাবী কার্পেণ্টারের স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপনার্থে বঙ্গমহিলাগণের যে সভা হয় তাহাতে পঠিত।)

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,

২৪নং বীডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৯।

উৎসর্গ।

যে পরোপকারিণী মহিলা স্বীয় সাধু কার্য্য দ্বারা নারী-জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

কুমারী কার্পেণ্টারের

জীবন চরিত।

ভারত-হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের মৃত্যু-জনিত শোক-প্রকাশ, ও তাঁহার স্মরণার্থে কোন প্রকার স্মৃতি সংস্থাপন উদ্দেশে, গত ১০ই জুলাই এদেশীয় মহিলাগণের যে একটী সভা হইয়াছিল, তাহাতে কুমারী কার্পেণ্টারের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটী পঠিত হয়। তৎপরে কোন কোন বন্ধু ইহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। প্রথমে একান্ত অল্প সময়ের মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এখন তাহারই দুইএক স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করা গেল। কুমারী কার্পেণ্টার এ দেশের কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, ভারতবর্ষ তাঁহার জন্মভূমি নয়, তথাপি তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগ এ দেশীয় সকলের এত শোকের কারণ কেন হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি এ দেশের পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, তাঁহার অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে এ দেশীয় কুলকন্যাগণের অনেক উপকার হইয়াছে, এই সকল কার্য্যের জন্য কুমারী কার্পেণ্টার এ দেশে এতদূর আদরণীয়া ছিলেন। তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়াই সকলে তাঁহার বিয়োগে শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রকার গুণবতী পরোপকার-

ব্রতশীলা মহিলার জীবন প্রত্যেক কুলকন্যার অনুকরণ-যোগ্য। ইহাঁর জীবন-চরিত পাঠ করিতে আমাদের দেশীয় অনেক কুলকন্যাই বোধ হয় ব্যগ্র হইবেন, বিশেষতঃ এই প্রকার জীবন পাঠ দ্বারা অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা, এই বিশ্বাসে ইহাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র জীবনীটী লিখিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদি একটীও কুলকন্যার হৃদয়ে সৎকার্য্যে উৎসাহ এবং পরোপকার-ব্রত সাধনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, তবেই লেখিকার সমুদয় শ্রম সার্থক ও আশা পূর্ণ হইবে।

বিখ্যাত-নাম্নী কুমারী কার্পেণ্টার ইংরেজী ১৮০৭ সনের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডস্থ এক্সটার নামক স্থানে লেণ্ট কার্পেণ্টার নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইহাঁর পিতার প্রথম সন্তান ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টারের দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, তাঁহার পিতা এক্সটার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিষ্টল নগরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। অতি শৈশব কাল হইতে তনয়ার শিক্ষা লাভের ইচ্ছা অতি বলবতী দেখিয়া কুমারী কার্পেণ্টারের পিতা স্বীয় ছাত্রবর্গের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কুমারী কার্পেণ্টারের সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কুমারী কার্পেণ্টার পিতার প্রযত্নে ক্রমে গণিত-শাস্ত্র ও গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন দুরূহ ভাষা সমূহ শিক্ষা করিয়া উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করেন। এ দেশের কথা দূরে থাকুক, সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডস্থ জন-সাধারণেরও সংস্কার এই যে, উচ্চশিক্ষা

কোমল-প্রকৃতি নারী-জাতীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অপকারী। এই সংস্কার যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল, কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন আলোচনা করিলে তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, "উচ্চ-শিক্ষা গৃহধর্ম্ম পালনে আমাকে অনুপযুক্ত না করিয়া বরং নারীজাতীর সমস্ত কর্ত্তব্যসংসাধনে আমাকে সর্ব্ব প্রকারে অধিকতর উপযুক্ত করিয়াছে।"

পরোপকার সাধনের প্রবল ইচ্ছা নবীন বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। পরের দুঃখ দর্শন করিলে তাহা মোচন করিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি কখনও নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। ব্রিষ্টল নগরস্থ দরিদ্র-মণ্ডলীর পর্ণ কুটীরে কুমারী কার্পেণ্টার স্বাভাবিক দয়া-বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। দরিদ্র-গৃহে গমন করিয়া রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা এবং অভাবে সাহায্য দান, তাঁহার নিত্য-কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি উপায়হীন দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সাধু চেষ্টা দ্বারা শত শত অসহায় দরিদ্র লোক জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে পরোপকার-ব্রত পালন করিতে করিতে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, যে কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীতে তাঁহার নাম এতদূর সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে, এই ব্রিষ্টল নগরেই তাহার সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাঁহার পরোপকার-সাধন-বৃত্তি কেবল এই নগরে আবদ্ধ ছিল না। ক্রমে তাহা দুরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্তও

পরিব্যাপ্ত হয়, এবং নানা স্থান তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া উঠে। পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসংখ্য দরিদ্র-সন্তান যে প্রকার কষ্টে ও শোচনীয় ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কুমারী কার্পেণ্টার সর্ব্বদা দরিদ্র কুটীরে গমনপূর্ব্বক তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন। ইংলণ্ডে পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুগণের দুরবস্থা কতদূর প্রবল, তাহা হয় ত আমাদের দেশীয় লোকে অনুমান করিতে পারেন না। কেননা, দুর্ভিক্ষ কিম্বা ভীষণ মহামারী ভিন্ন এই প্রকার দৃশ্য এ দেশে অতি বিরল। ইংলণ্ডস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকের তুলনায় আমাদের দেশীয় নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোকের অবস্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীস্থ লোকদের মধ্যে দরিদ্রতা অত্যন্ত প্রবল, তন্মধ্যে অনেকেই আবার সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে আসক্ত। ইহাদের পারিবারিক বন্ধনও আমাদের দেশের পারিবারিক বন্ধন অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শিথিল। এই সকল কারণে এই শ্রেণীস্থ অনেক পিতা মাতা সহজেই সন্তানকে স্বাভাবিক স্নেহে বঞ্চিত করিয়া রাজপথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। এই সকল নিরাশ্রয় শিশুর ভরণ পোষণের জন্য ইংলণ্ডে এক প্রকার বিদ্যালয় আছে, সেই স্থানে শিশুগণকে পরিধেয় প্রদান ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী নানা প্রকার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল দুরবস্থাগ্রস্ত ছিন্ন-বসনধারী শিশুগণ মাত্র এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারী বলিয়া, ইহার নাম "র্যাগেড" (Ragged School) স্কুল। কুমারী কার্পেণ্টারের অপ্রতিহত যত্নে ও

অধ্যবসায়-বলে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নিরাশ্রয় শিশুগণের জন্য ব্রিষ্টল নগরে এই প্রকার একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কাল-ক্রমে ইহা শ্রমিক-বিদ্যালয় রূপে পরিণত হইয়াছে।

ভদ্রবংশীয়া কুল-কন্যাগণের শিক্ষা বিধানের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিতে কুমারী কার্পেণ্টারের পিতার একান্ত প্রয়াস ছিল। এই প্রকার বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের উপযুক্ত করিবার মানসে তিনি নিজ তনয়াকে তদনুরূপ শিক্ষা-দান উদ্দেশে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে প্রেরণ করেন। কুমারী কার্পেণ্টার শিক্ষা সমাপ্তি করিয়া, মাতা ও ভগ্নীর সাহায্যে এই প্রকার একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পরিশেষে তথায় শিক্ষাদানের সমুদয় ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করেন। বিদ্যালয়স্থ ছাত্রীদিগকে নানা প্রকার সুকুমার বিদ্যা ও সাধারণ শিক্ষা দান ভিন্ন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাও প্রদত্ত হইত। উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দরিদ্র ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দানরূপ মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ সংসারে প্রবেশ করিয়া সাংসারিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উৎকৃষ্ট জননী ও উৎকৃষ্ট গৃহিণীরূপে গণ্য হইয়াছেন।

সদ্বংশজাত কুলকন্যাগণের শিক্ষাদান প্রণালী নিজের ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তি-দিগের চরিত্র সংশোধনার্থে কোন প্রকার উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত, কুমারী কার্পেণ্টারের পর-দুঃখ-কাতর হৃদয় একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। সেই সময়ে পাপাসক্ত লোকদিগের যে

প্রকার শোচনীয় দুরবস্থা ছিল, তাহাতে কুমারী কার্পেণ্টারের ন্যায় একজন কর্ত্তব্য-পরায়ণা, অধ্যবসায়শীলা গুণবতী মহিলা যদি তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত না হইতেন, তবে অন্যের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। তৎকালে দুষ্ক্রিয়াশীল পশু-প্রকৃতি লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াতে সর্ব্বদা লিপ্ত হইত, এবং নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আপনাদের ঘৃণিত ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিয়া তুলিত। ইহাদের মধ্যে সাধারণের অপরিজ্ঞেয় এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত ছিল। কোন স্থানে চৌর্য্য বৃত্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে ইহারা ছল প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগকে অভিপ্রেত স্থানে প্রেরণ করিয়া সমুদয় সন্ধান অবগত হইত। এই শ্রেণীস্থ লোকেরা স্বীয় ব্যবসায়ে এ প্রকার শিক্ষিত এবং পাপ কার্য্য তাহাদের এত স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত ছিল, যে সাধারণের নিকট আত্ম-শ্লাঘার সহিত আপনাদিগের গুণ-গ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। এই শ্রেণীস্থ একটী স্ত্রীলোক গৌরবের ভাবে বলিয়াছে, "আমি অন্ততঃ ৫০টী বালিকাকে জেব হইতে অর্থ অপহরণের বিদ্যা শিখাইয়াছি"। সেই সকল হতভাগ্য বালিকার সহিত এই নীচ-প্রকৃতি স্ত্রীলোক একটা কদর্য্য স্থানে বাস করিত। একজন ভদ্র মহিলা ইহার দুই কন্যাকে কোন এক অনাথালয়ে রাখিবার সদুপায় করিয়াছিলেন, তাহাতে সে অতি আক্ষেপের সহিত বলিল, "বিখ্যাত পকেট-অপহরণ-বিদ্যা-বিশারদ শিক্ষকের নিকট আমি কত ব্যয় স্বীকার করিয়া কন্যাদ্বয়কে

সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছি, এখন যদি ইহারা অনাথালয়ে যায়, তবে যে আমার সমুদয় ব্যয় ও ভবিষ্যৎ আশা বিফল হইবে।"

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ একটী সামান্য অপরাধ করিলেও রাজ-বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে, একবার কারাগারে গমন করিলে ইহাদের স্বভাব সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অসৎ-প্রকৃতি লোকদের সংসর্গে ইহারা দুষ্কর্ম্মে অধিক পরিমাণে অনুরক্ত হইয়া উঠে, এবং মুক্তি লাভের অনতিকাল বিলম্বেই নূতন পাপে লিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কারাগারে প্রবেশ করে। একবার কারাগারে গমন করিলে এই সকল বাল-অপরাধী আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এমন কি, ভৃত্য-ভাবেও তাহাদিগের কোন পরিবারে প্রবেশ করিবার উপায় থাকে না। তখন ইহারা চৌর্য্য প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। কুমারী কার্পেণ্টার ইহা-দিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই সকল বাল-অপরাধীর পুনরুদ্ধার ভিন্ন সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। সেই হইতে বাল-অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত সংস্কারক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার দৃঢ় ইচ্ছা হয়। এই শুভ সঙ্কল্প সাধন উদ্দেশে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কারক-বিদ্যালয়ের একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৫৩ অব্দে "বাল-অপরাধীদিগের অবস্থা ও তাহাদের প্রতি ব্যবহার" সম্বন্ধে আর একখানা গ্রন্থ লিখিয়া মুদ্রিত করেন। এই সময় হইতেই তিনি এই মহৎ

কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত।

কার্য্য সাধনের জন্য অবিচলিত অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের উপায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে নিজ ক্ষমতাধীনে রাখিয়া, সংশোধিত ও সমাজের উপযুক্ত করিতে হইলে রাজ-বিধি-সম্মত বিশেষ ক্ষমতা লাভ আবশ্যক। কুমারী কার্পেণ্টার সংস্কারক-বিদ্যালয় সংস্থাপনের পূর্ব্বে এই প্রকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। এই বিষয়ে রাজপুরুষগণের অভিমতি জন্মাইবার জন্য তাঁহাকে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সমুদয় প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তিনি এই ক্ষমতা লাভ করেন। ১৮৫৪ অব্দে এই সম্বন্ধে একটী রাজ-নিয়ম বিধি-বদ্ধ হয় এবং এই সময় হইতে ইংলণ্ডস্থ অনেক লোকের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা অনেকেই সংস্কারক বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে কুমারী কার্পেণ্টারকে যথেষ্ট সাহায্য দান ও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে কোন ব্যক্তি যদি একটী সদনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হন, তবে সর্ব্ব সাধারণেই তাহাতে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে সাহায্য দান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। সুবিখ্যাত কবি লর্ড বায়রণের সহ-ধর্ম্মিণী বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য নিজ ব্যয়ে ব্রিষ্টল নগরস্থ "রেডলজ" নামক একটা প্রাচীন অট্টালিকা ক্রয় করিয়া দেন। ১৮৫৪ অব্দে এই বাটীতে সংস্কারক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং লেডি বায়রণের অনুরোধে কুমারী কার্পেণ্টার তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটনের আর কোন স্থানে এই প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। কেবল

মাত্র বালিকারা "রেডলজ সংস্কারক-বিদ্যালয়ে" গৃহীত হইয়া থাকে। চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে দণ্ড-প্রাপ্ত বালিকাগণকে কারাগারে প্রেরণের পরিবর্ত্তে এই স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই স্থানে থাকিয়া কুমারী কার্পেণ্টারের ঐকান্তিক যত্নে অপরাধী বালিকাগণ যে প্রকার সংশোধিত-চরিত্র ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে তাঁহাকে এই সাধুকার্য্যের জন্য মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে হয়। কুমারী কার্পেণ্টারের নিরতিশয় যত্ন ভিন্ন এই সকল অসহায়া বালিকার মুক্তির আর কোন উপায়ই ছিল না। দুই বৎসরের অন্যূন এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল বিদ্যালয়ে থাকিতে হইবে এই নিয়মে বালিকাগণকে গ্রহণ করা হয়। চরিত্র সংশোধনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নে ইহাদিগকে নীতি শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সাধারণ ভাবে লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে ভাবী জীবনে যাহাতে ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, এই প্রকার নানা কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া বালিকাদের চরিত্র আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যালয় ত্যাগের পর অনেক বালিকা সৎপ্রকৃতি স্বামী লাভ করিয়া উত্তমরূপে ও ভদ্র-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ বা ভদ্র-পরিবারে সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। "রেডলজ সংস্কারক বিদ্যালয়ের" শুভ ফল দর্শনে অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সংস্কারক বিদ্যালয় সকল অপরাধীগণের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে

সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া অতি ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিত, কারাগারের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ যাহাদের অভ্যস্ত ছিল, সমাজকে যাহারা আপ-নাদের শত্রু জ্ঞান করিয়া যথাসাধ্য তাহাব অনিষ্ট সাধন করা আপনাদের কার্য্য বলিয়া মনে করিত, শিক্ষার গুণে সেই সকল লোকই নূতন জীবন লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ বা অন্যকে সংশোধিত করি-বার চেষ্টা করিতেছে। সংস্কারক-বিদ্যালয় স্থাপনের পর হইতে অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বেব তুলনায় অনেক অল্প দৃষ্ট হয়। একবার যাহারা সংস্কারক-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার অপরাধ করিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে এ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সংস্কারক- বিদ্যা-লয়ের ছাত্রীগণ যে কেবল দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছে তাহা নহে, অনেকের হৃদয়ে সাধুবৃত্তি সকল আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহারা সেলাই প্রভৃতি উপায়ে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, দরিদ্রলোক দেখিলে সেই অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়, ইহা অনেক সময়ে দৃষ্টি হইয়াছে, এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের সচ্চরিত্রতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছে।

চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ লিপ্ত ব্যক্তিগণকে কারাগারে প্রেরণের উদ্দেশ্য কেবল তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দান করা, অনেকেরই এই সংস্কার। অপরাধীগণ যে কৃপার পাত্র, দণ্ড প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে যে সমাজ বাধ্য, অতি অল্প লোকই তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন। সমাজ ইহাদিগের প্রতি যেপ্রকার কঠোর

ব্যবহার করে, কারামুক্ত হইয়া ইহারাও আবার অনেক স্থলে সমাজের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া সেই প্রকার প্রতিশোধ দান করে। অপরাধীগণকে সংশোধিত-চরিত্র করিয়া সমাজে পুনঃ গ্রহণ ভিন্ন সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্ভবে না। কারাগারে যে সকল লোক একবার প্রবেশ করে, পাপ কার্য্য ত্যাগ দূরে থাকুক, বরং অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া তাহাদের অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কারক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কুমারী কার্পেণ্টার অপরাধীদিগের চরিত্র-সংশোধন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বহুবিধ অনিষ্ট দর্শন করিয়া কারাবাসীগণের দুরবস্থার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "আমাদের কারাবাসী"(Our Convicts) এই নামে দুই খণ্ড পুস্তক প্রচার করেন। কারাগার সমূহের দূষিত প্রণালী হইতে কয়েদীগণের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, এই পুস্তক প্রচার দ্বারা তিনি তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। তৎপরে কারাগার সকলের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশে কতকগুলি উপায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কারাগার মধ্যে তৎসমুদয় প্রচলনের পরামর্শ দেন। সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার পরিশ্রম বিফল হয় নাই, এবং ধর্ম্ম ও নীতির অনুমোদিত তাঁহার প্রদর্শিত উপায় গুলি ইংলণ্ডস্থ কারাগার সকলে অনেক পরিমাণে অবলম্বিত হইয়া কারাবাসীগণের অবস্থার উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহুবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

সুবিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় কুমারী কার্পেণ্টারের পিতার এক জন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে

গমন করেন, তখন কুমারী কার্পেণ্টারের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ছিল। তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়কে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার পিতার বন্ধুর ভবনে যখন রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়, তখন কুমারী কার্পেণ্টার তাঁহার অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় আত্মীয় পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, ইহা একান্ত কষ্টকর ঘটনা। কিন্তু সেই দূরদেশে মৃত্যু সময়ে সকলে তাঁহার প্রতি যে প্রকার প্রগাঢ় যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে যে প্রকার শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখের মধ্যেও আহ্লাদ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কুমারী কার্পেণ্টার এই মর্ম্মে একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, "যিনি এই অপরিচিত দেশে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার মত ও কার্য্য যদিও এখন লোকের নিকট আদরণীয় নয়, তথাপি ভবিষ্যতে এমন দিন অবশ্য আসিবে, যখন লোকে তাঁহার প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া তাঁহার ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে।" প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী কার্পেণ্টার যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া তাহা পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর কুমারী কার্পেণ্টার তাঁহার কেশ, উপবীত, বস্ত্রের অংশ প্রভৃতি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি ব্রিষ্টলে গমন করিলে তিনি অতি আগ্রহের সহিত মৃত রাজার সমাধিস্থান

প্রভৃতি দর্শন করাইতেন। "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের শেষ ভাগ" নামে তিনি এক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত না হইলে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের নিকটে অপ্রকাশিত থাকিত। মহৎ লোকেরা স্বীয় স্বীয় জীবন দ্বারা কত বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করেন! রামমোহন রায় কুমারী কার্পেণ্টারের হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ-বীজ রোপণ করিয়া যান, কালক্রমে তাহাই বৰ্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে আগমন করিতে ও ভারতের হিত সাধনে প্রবৃত্ত করে।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন, কেবল এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি কুমারী কার্পেণ্টারের প্রথম অনুরাগ জন্মে। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন। ইংলণ্ড ও এদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি এবং এদেশের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উন্নতি বিধান তাঁহার ভারত-বর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। এদেশে আগমন করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই এদেশীয় বালিকাবিদ্যালয় সকলের এ প্রকার হীনাবস্থা। মান্দ্রাজ, বম্বে এবং বাঙ্গালা এই তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনের মানসে তিনি প্রথমে গবর্ণর জেনেরলের নিকট ৩৬,০০০ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। সেই আবেদনে কোন ফললাভ হয় না। তৎপরে কি কি প্রণালীতে শিক্ষয়িত্রী

বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া উচিত, তৎসমুদয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে সাহায্য প্রার্থী হন। এই স্থলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, ষ্টেট সেক্রেটারী প্রতি প্রেসিডেন্সির জন্য ১২,০০০হাজার টাকা বার্ষিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হন। এই অর্থ দ্বারা কুমারী কার্পেণ্টারের প্রযত্নে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বম্বেতে ৩টী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে,উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে অল্পদিন পরেই কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। তৎপরে তিনি ইংলণ্ডস্থ সামাজিক-বিজ্ঞান-সভার অনুরূপে বম্বে ও কলিকাতা নগরে দুইটী সভা সংস্থাপন করেন। স্ত্রী কয়েদী-দিগের জন্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ ও তাহাদিগকে পরিদর্শনের জন্য স্ত্রী পরিদর্শক নিযুক্ত করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক প্রয়াস পান। কারাগার সমুদয়ের শাসন প্রণালীর কঠোরতা হ্রাস করিয়া কয়েদীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও প্রণয়ন করেন, এবং দরিদ্র বালকদিগকে দরজীর কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য Ragged স্কুল নামে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইবার তিনি মধ্য-ভারতবর্ষ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তিনি ঐ সকল স্থান পরিদর্শন এবং বম্বে বিভাগের কারখানা সমূহে যে সকল বালক বালিকা কার্য্য করে,তাহাদের শিক্ষার জন্য প্রতি কারখানার নিকটে একটী একটী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং কি নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য

নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়, তাহাও প্রদর্শন করেন। এইবার তিনি কলিকাতায় না আসিয়া বম্বে হইতেই স্বদেশে গমন করেন। তথায় পৌহুঁছিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রকার সামাজিক উন্নতি সাধন উদ্দেশে "জাতীয় ভারত-সভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভা সংস্থাপন দ্বারা ইংলণ্ডস্থ অনেক লোকের সহানুভূতি ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এ দেশে যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষরূপে প্রচলিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাও সভার প্রধান উদ্দেশ্য। কুমারী এক্রয়েড্(এখন Mrs. Beveridge)মাননীয়া শ্রীমতী ফিয়ারের সাহায্যে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এ দেশীয় কুলকন্যাগণের শিক্ষার জন্য যে একটী সুপ্রণালী বদ্ধ Boarding School স্থাপন করেন, কুমারী কার্পেণ্টার নিজ হইতে দুই বৎসরের জন্য তাহাতে দুইটী বৃত্তি দান করিয়াছিলেন।

কুমারী কার্পেণ্টার অতি বৃদ্ধ বয়সে ১৮৭৫ সনের শেষ ভাগে আর একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। এইবার তিনি ঢাকা নগরে গমন করিয়া তথাকার সামাজিক ও স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার যত্নে ঢাকা ও কলিকাতা নগরে "জাতীয় ভারত-সভার" দুইটী শাখা সংস্থাপিত হয়। অনেক কার্য্য করিবার মানসে তিনি এইবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এ দেশে আগমন করাতে দেশশুদ্ধ সর্ব্ব সাধারণে তদানুসঙ্গিক আমোদ প্রমোদে অতি ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য

অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এইবার তিনি অতি আহ্লাদের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমি যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করি, তখন স্ত্রী-শিক্ষার কি অবস্থা ছিল, আর এখন কি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কত উন্নতি দৃষ্ট হয়।" সেই বৃদ্ধ বয়সেও আর একবার ভারতবর্ষ দর্শন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন "আর একবার মাত্র আমি ভারত-বর্ষে আসিব।" তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া তিনি অনেক প্রকার হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে এই পৃথিবী হইতে অবসৃত করিল। যে প্রকার প্রশান্ত ভাবে ও নীরবে তিনি এই লোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য-জনক। কিছুমাত্র যাতনা ভিন্ন মৃত্যুর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কুমারী কার্পেণ্টারের মৃত্যুকালীন সমুদয় ঘটনা অবগত হইলে বোধ হয় কৃতান্ত যেন সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার অবিনশ্বর আত্মাকে হরণ করিয়া অপর-লোকে প্রস্থান করিয়াছে। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী বিষয় লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন, তৎপরে শয়ন করিতে গমন করেন। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব দর্শনে তাঁহার পালিতা কন্যা শয়ন-কক্ষে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত

করিবার প্রয়াস পাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ-শূন্য দেহ শয্যায় পতিত রহিয়াছে। অবিলম্বে চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দ্বারা মৃত্যু নিশ্চয় করিলেন। অতি নিকট আত্মীয় ভিন্ন আর কাহাকেও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করা হয় নাই, তথাপি এই সংবাদ অচিরে সমস্ত ব্রিষ্টল নগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল, অমনি প্রধান রাজ-পুরুষ হইতে অতি সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়স্থ লোক কুমারী কার্পেণ্টারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানসে মৃত দেহের সহিত সমাধিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। রেডলজ সংস্কারক-বিদ্যালয়ের ও শ্রমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রীগণ শোক-পরিচ্ছদ পরিধান ও হস্তে পুষ্প গুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি শোকাকুল চিত্তে পদব্রজে সমাধি ভূমিতে গমন করিতে লাগিল। তাহারা যে কেবল নিয়ম রক্ষার্থে শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, তাহা নহে, তাহাদের মুখশ্রীতে শোকের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছিল। কুমারী কার্পেণ্টার যে দুইটী বাঙ্গালী বালককে ইংলণ্ডে লইয়া যাইয়া নিজ ব্যয়ে শিক্ষিত করিতেছিলেন, শোক পরিচ্ছদধারী সেই দুইটী শিশুকে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া অনেকেরই চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ন্যায় বৃহৎ স্থানে প্রতিদিন কত শত লোক ইহলোক পরিত্যাগ করে, কে তাহার সন্ধান লয়। এই প্রকার স্থানেও তাঁহার সমাধি ভূমিতে যে প্রকার জনতা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে যে, তিনি সর্ব্ব সাধারণের নিকট কতদূর সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রেডলজ সংস্কারক

বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ মাতৃহীন, দরিদ্রগণ আশ্রয়-শূন্য ও সর্ব্ব সাধারণ একটী পরম হিতকারিণী সুহৃদ হারা হইয়াছেন! এই মহিলার নিকট ভারতবাসী সকলেই, বিশেষতঃ নারী-গণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তিনি আমাদের যে পরিমাণে হিত-সাধন করিয়া গিয়াছেন, কি উপায়ে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে পারি, আমাদের প্রত্যেকেরই সেই চিন্তা করা উচিত। কুমারী কার্পেণ্টার স্বীয় মহৎ জীবন দ্বারা পরোপকার ব্রতের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। তিনি আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া সমুদয় জীবন কেবল পরোপকার সাধনার্থে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে দুর্ব্বল-প্রকৃতি নারী সংসারের কার্য্য করিতে অক্ষম? অধ্যবসায় ও কার্য্য-কারিতা শক্তিতে তিনি অনেক পুরুষকে পরাভব করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অটল অধ্যবসায় ও পরোপ-কার সাধনের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু পর্য্যন্ত সমান প্রবল ছিল। তিনি যে সকল হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যা-লোচনা করিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রচুর ধনশালিনী রমণী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তাদৃশ সম্পত্তি-শালিনী ছিলেন না। মিতব্যয়িতা গুণ তাঁহার বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। সাংসারিক কার্য্য সকল তিনি একান্ত মিত-ব্যয়িতার সহিত অথচ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হইত। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে তাঁহার অল্পই দৃষ্টি ছিল। সকল বিষয়ে

তিনি একান্ত মিতাচারী ছিলেন, জীবন ধারণের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হইত। আড়ম্বর-পূর্ণ জীবন তিনি বিশেষ ঘৃণাকরিতেন। গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার অধিক দাস দাসী ছিল না। অধিকাংশ গৃহ-কার্য্য স্বহস্তেই নির্ব্বাহ করিতেন। এই ভাবে থাকিয়া নিজ ব্যয়ের অর্থ হইতে যে কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেন, সৎকার্য্যানুষ্ঠানে তাহা পর্য্যবসিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে কখনও অর্থের অপ্রতুল হয় না। এই বাক্যের সারবত্তা তিনি স্বীয় কার্য্য দ্বারা জন-সমাজে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি কোন সৎকার্য্যের সূচনা করিতেন অমনি চারিদিক হইতে সদাশয় ব্যক্তিগণ অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য প্রেরণ করিতেন। সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া অর্থের অভাব তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে সাধারণের হিতকর কার্য্যাদিতেই অনুক্ষণ একান্ত ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাঁহার অবকাশ অতি অল্প ছিল, তথাপি গৃহসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালনে তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না। গৃহ-কার্য্যের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিধান ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে তিনি একান্ত যত্নবতী ছিলেন। সাংসারিক অতি ক্ষুদ্র বিষয় পর্য্যন্ত স্বচক্ষে পরিদর্শন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার এতদূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য পর্য্যন্তও স্থান-ভ্রষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টি তৎপ্রতি নিক্ষিপ্ত হইত। সাধা-

রণতঃ লোকের সংস্কার এই যে, অধিক পরিমাণে জ্ঞানালোচনা করিলে স্ত্রী জাতির কোমল হৃদয় কঠোর ও শুষ্ক হইয়া উঠে এবং গৃহ-কার্য্যাদি সংসাধনে তাঁহারা ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। এই সংস্কার যে ভ্রান্তিমূলক তাহা কুমারী কার্পেণ্টার স্বীয় প্রকৃতি ও জীবন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যদিও সাহস, ক্ষমতা, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতা শক্তিতে তিনি পুরুষ জাতির সমকক্ষ ভিন্ন হীন স্থানীয়া ছিলেন না, তথাপি তাঁহার হৃদয় শিশুর ন্যায় কোমল ছিল। সামান্য দুর্ঘটনায় তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইত। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হন, এই শোকে তিনি একান্ত অধীর হইয়াছিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত এই শোক তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল; এমন কি, তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা-জনিত এই শোক-প্রাবল্যকেই কেহ কেহ তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ইউনিটেরিয়ান নামে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর এক ও অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ত্রিমূর্ত্তিবাদীদিগের ন্যায় খৃষ্টকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া এক জন বিশেষ ক্ষমতাশালী মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কুমারী কার্পেণ্টার এই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। "প্রাতঃ ও সায়ং চিন্তা এবং উপাসনা" নামে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় মধ্যে এই পুস্তক বিশেষরূপে সমাদৃত। জ্ঞানের বিমল প্রভাব

সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ হইলে নারীর কোমল হৃদয় কি প্রকার মনোহারিণী শোভা ধারণ করে, কুমারী কার্পেণ্টারই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতবর্ষ তাঁহার কত প্রিয় ছিল, নিম্নের ঘটনাটী পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গের কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে একটী মূল্যবান অঙ্গুরীয় উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাহা স্বীয় অঙ্গুলীতে ধারণ করিতেন। একদা তাঁহার এ দেশীয় জনৈক বন্ধুকে অঙ্গুরীয়টী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের সহিত আমি যে পরিণীত হইয়াছি এই অঙ্গুরীয় তাহার নিদর্শন।"

আমরা যদি পরলোক-বাসিনী কুমারী কার্পেণ্টারের কৃত উপকার বুঝিয়া থাকি, তবে যে সকল কার্য্য দ্বারা তিনি পৃথিবীর এত উপকার করিয়া গিয়াছেন সেই সকল কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের উচিত। আমরা যদি তাঁহার নাম স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি তবে তাঁহার প্রদর্শিত সৎদৃষ্টান্ত অবলম্বন করা বিধেয়। যে সকল গুণে কুমারী কার্পেণ্টার, কুমারী নাইটিঙ্গেল, এলিজেবেথ ফ্রাই প্রভৃতি মহিলাগণ এতদূর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এ দেশীয়া মহিলাগণের হৃদয়েও সেই সকল গুণের অভাব নাই। দয়া, স্নেহ, কোমলতা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণে অন্য দেশীয়া নারীগণ ভারত-মহিলাগণকে কোন প্রকারে পরাস্ত করিতে পারেন না। ইহাঁদের হৃদয় সকল প্রকার সদ্‌গুণে ভূষিত, তথাপি ইংলণ্ড-বাসিনী ও ভারত-বর্ষীয়া মহিলা এই দুয়ের হৃদয়গত ভাবের মধ্যে স্রোতস্বতী ও তড়াগের ন্যায় বিভিন্নতা

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তড়াগ ও স্রোতস্বতী উভয়ে এক সলিল বিশিষ্টা হইলেও ইহাদের পরস্পরের কার্য্যে কত প্রভেদ। স্রোতস্বতী অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইয়া নিজ সলিলে কত দেশ প্লাবিত, কত শত জীবের পিপাসা শান্তি, কত মরুভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া অবিরাম গতিতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। তাহার গতির বিরাম নাই, কার্য্যের শেষ নাই। আর তড়াগের কার্য্য কি, যাহারা নিকটে গমন করে, কিম্বা সন্নিকটে বাস করে, তড়াগ তাহাদেরই মাত্র পিপাসা দূর করিতে সমর্থ। ভারত ললনা এবং ইংলণ্ড বাসিনী উভয়ের হৃদয়ে একবিধ সদ্‌গুণ আছে, এই মাত্র বিভিন্নতা যে একের সদ্‌গুণ কেবল আত্মীয় ও নিকটস্থ লোকেরাই মাত্র ভোগ করিয়া থাকেন, আর অপরের সদ্‌গুণ কেবল পরিবার কিম্বা স্বদেশে নয়, কিন্তু সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলকে স্নিগ্ধ ও সুখী করে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয়া অনেক মহিলা বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরোপকার-ব্রতশীলা কুমারী কার্পেণ্টারের ন্যায় মহিলা কি আমাদের মধ্যে কখনও অবতীর্ণ হইবেন না? আমাদের দয়া প্রভৃতি গুণ চিরদিনই কি কেবল নিজ নিজ পরিবারেই আবদ্ধ থাকিবে? এই সঙ্কীর্ণ ভাব, অনুদার ভাব দূর না হইলে আমাদের হৃদয় কখনই প্রশস্ত ও উদার হইবে না। সংসারের সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার ভার

ঈশ্বর স্ত্রী-জাতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। যাহার যেমন সাধ্য তদনুসারে সকলেরই এই মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। নারীগণের স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কমনীয় গুণ সকল যে পর্য্যন্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া দরিদ্র, দুঃখী, পাপ তাপ-গ্রস্ত মানব সকলকে শান্তি দান ও স্নিগ্ধ না করিবে, তত দিন আমাদের সমাজের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্পূর্ণ থাকিবে। অনেকে বলিতে পারেন ক্ষমতা নাই, প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তবেই আর এ আপত্তি উত্থাপন কবিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইবে না। তিনি একজন স্ত্রীলোক হইয়া কেবল স্ত্রী জাতির নয়, কিন্তু সাধারণতঃ সকলের উন্নতির জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের উৎসাহ, কার্য্যকারিতা-শক্তি নবীন বয়স্ক ব্যক্তি-গণের পক্ষেও অনুকরণযোগ্য।

আজ আমরা যাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই গৃহেই বসিয়া কত আশা প্রকাশ, কত উৎসাহ-জনক বাক্য বলিয়া-ছিলেন। গত জীবনের সেই সকল ঘটনাবলী আজ পরিস্কৃত-রূপে স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠিতেছে। এই গৃহস্থ ঐ আসনে উপবিষ্ট হইয়া একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক কত আদর ও উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন "তুমি ইংলণ্ডে গেলে আমি তোমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিব।" সেই জীবন্ত উৎসাহশীলা মহিলা আজ কোথায়? এই পৃথিবীতে আমরা আর তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিব না। মৃত্যু সংসারের

সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার আত্মাকে দিব্য ধামে লইয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। বয়স বিবেচনা করিলে তাঁহার যে অকালে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কথনই বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার সেই অবিচলিত উৎসাহ, উদ্যম, মানসিক তেজ এবং বদন মণ্ডলের প্রফুল্লতা মনে হইলে তাঁহার বয়স বিস্মৃত হইয়াই হৃদয়ে এই আক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, তিনি কেন এত শীঘ্র পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি এই পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্য, তাঁহার সদ্‌গুণের ফল, যশ, খ্যাতি এ সকলই অবিকৃত রহিয়াছে। যত দিন পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকার, পরোপকারব্রত-পালন, প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাদর থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ধরণীতলে তাঁহার নাম বর্ত্তমান থাকিবে।

সমাপ্ত।